১৫ আগস্টের ছুটি পুনর্বহাল প্রসঙ্গে

জোট সরকার নয় বরং আওয়ামী সরকারের সিদ্ধান্তই অস্বচ্ছ, অসঙ্গত ও কর্তৃত্বপরায়ণ ছিল বলা যায়। আওয়ামী সরকারের এই সিদ্ধান্ত যে জনচেতনার পরিপন্থী ছিল তা পরবর্তী নির্বাচনে (২০০১) আওয়ামী লীগের ভরাডুবি থেকেই স্পষ্ট হয়েছে।

কিছুদিন আগে উচ্চ আদালতের রায়ে ২০০২ সালের ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস বাতিলের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার কার্য বিবরণীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে জনৈক মোজাম্মেল হকের দায়েরকৃত একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত এই রায় প্রদান করেন। জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত আদালতের রায়ে বাতিলের ঘটনা নজিরবিহীন। শোক দিবস বাতিলের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণার স্বপক্ষে আদালত ২টি কারণ ব্যক্ত করেছেন। প্রথম কারণটি হলো ১৫ আগস্ট শোক দিবস বাতিলের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কার্যবিরণীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বাক্ষর না থাকা। সরকারি কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে যারা সাম্যক অবহিত তারা সবাই জানেন, সরকারি সিদ্ধান্ত দুইভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে নোটের মাধ্যমে; অপরটি হচ্ছে সভার মাধ্যমে। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রথমে তা নোট আকারে ফাইলে উপস্থাপন করা হয় এবং ধাপে ধাপে এই নোট বিভিন্ন কর্মকর্তার সুপারিশ-মনত্মব্যসহ চূড়ান্ত অনুমোদনকারীর কাছে পৌঁছে। চূড়ান্ত অনুমোদনকারী ব্যক্তি নোটে অনুমোদন করে স্বাক্ষর করলেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য হয়। অতঃপর অফিস আদেশ জারির মাধ্যমে প্রস্তাব/সিদ্ধান্তটি প্রচার করা হয়। সাধারণত অনুমোদিত নোটের বরাতে অফিস আদেশ জারি করা হয়। তাই অফিস আদেশে আর অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর করার প্রয়োজন হয় না। অধঃস্তন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে অফিস আদেশ জারি করা হয়। অনুরূপভাবে সভার মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে গৃহীত সিদ্ধান্তটি সভার কার্যবিবরণী প্রকাশের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। কার্যবিবরণীও সভার সভাপতির পরিবর্তে অধঃস্তন কর্মকর্তার স্বাক্ষরে জারি করা হয়। কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম-পদবি উল্লেখ থাকে। তবে সেখানে তাদের স্বাক্ষর করার প্রয়োজন হয় না। কেননা সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতির জন্য স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। কার্যবিবরণীতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম বা পদবির উপরে কেবল স্বাক্ষর স্বাক্ষর বা স্বাক্ষরিত কথাটি উল্লেখ করা হয়। অফিস আদেশের অনুরূপ সভার কার্যবিবরণীও সংশ্লিষ্ট দফতরের নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরে জারি করা হয়। কার্যবিবরণীতে খালেদা জিয়ার স্বাক্ষর না থাকার বিষয়টির প্রতি তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ সচিব সাদাত হুসাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান, এভাবে স্বাক্ষর কথাটি মুদ্রিত থাকা মানেই প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত করেই বলেছেন প্রধানমন্ত্রী উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিলেন। তাই সভার কার্যবিবরণীতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার স্বাক্ষর না থাকার কারণে তিনি মন্ত্রিপরিষদের ঐ সিদ্ধান্ত (শোক দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত) অনুমোদন করেননি- একথা বলার কোনো অবকাশ নেই। কোন কার্যবিবরণীতে অনুমোদনকারীর স্বাক্ষর থাকে না। ১৫ আগস্ট শোক দিবস বাতিল আদেশ অবৈধ ঘোষণার স্বপক্ষে মাননীয় আদালতের রায়ে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, 'এখানে আমরা শোক দিবস বাতিলের দুটি কারণ দেখতে পাচ্ছি। জোট মন্ত্রিসভা দেখেছে প্রথমত : এর আগে ১৫ আগস্টকে শোক দিবস হিসেবে পালনের কখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত : পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করা হয়েছে। কিন্তু এ দুটি কারণই তথ্যগতভাবে সঠিক নয় এবং সাংঘর্ষিক বটে। প্রথমত ৫ আগস্ট ১৯৯৬

সালে মন্ত্রিসভায় শোক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। দ্বিতীয়ত: ঐ সিদ্ধান্তের পর হতে ১৫ আগস্ট কেবল শোক দিবস নয়, জাতীয় শোক দিবস হিসেবে জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের আগে আগস্ট ২০০১ পর্যন্ত পালিত হয়েছে। উপরন্তু এই সিদ্ধান্ত বাতিলের প্রয়োজন হয়েছে কেবল সরকার পরিবর্তনের কারণেই।' আদালত মনে করেন 'যুক্তি সঙ্গত ও জনস্বার্থে না হলে পূর্ববর্তী সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কেবল সরকারের বদলের দোহাই দিয়ে করা যথার্থ হতে পারে না। অন্যথায় বিশ্বসভায় বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনের ধারাবাহিকতার বিষয়টি আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট তৈরি করবে। সুতরাং উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে এই উপসংহারে পৌছানো ছাড়া উপায় থাকে না যে, ২২ জুলাই ২০০২ জোট মন্ত্রিসভা কোনোরূপ মনোনিবেশ ছাড়াই তড়িঘড়ি করে শোক দিবস বাতিল করেছে এবং এটা জনস্বার্থে হয়নি। সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা ছিল না, এটা অসঙ্গত কর্তৃত্ব পরায়ণ।' এখানে উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ব্যাপকভাবে জনসমর্থিত এক সফল সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত হন। লক্ষণীয়- সামরিক অভ্যুত্থানে মুজিব সরকারের পতন হলেও সামরিক বাহিনী কিন্তু তখন রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেনি। তৎকালীন বাকশালের সিনিয়র নেতা, শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচর খোন্দকার মোশতাক আহমেদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের নিকটই ক্ষমতা প্রত্যার্পিত হয়। খোন্দকার মোশতাক প্রায় ৩ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। কিন্তু তার সরকার ১৫ আগস্ট শোক দিবস ঘোষণা করেনি। এরপর জেনারেল খালেদ মোশাররফ পাল্টা ক্যু করে খোন্দকার মোশতাককে পদচ্যুত করেন। আওয়ামী লীগ খালেদ মোশাররফের সমর্থনে রাজপথে মিছিল বের করে। খালেদ মোশাররফ বিচারপতি সায়েমকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সায়েমও ১৫ আগাস্ট শোক দিবস ঘোষণা করেননি। এরপর সিপাহী জনতার বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট পদে আসীন হন। তিনি প্রায় ৫ বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। কিন্তু তার সরকার ১৫ আগস্ট শোক দিবস বা সরকারি ছুটি ঘোষণা করেননি। জিয়াউর রহমান একটি ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে প্রচেষ্টায় নিহত হলে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও প্রায় এক বছর প্রেসিডেন্টের পদে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু তার সরকারও ১৫ আগস্ট শোক দিবস বা সরকারি ছুটি ঘোষণা করেনি। তৎকালীন প্রধান সেনাপতি জেনারেল এরশাদ চক্রান্ত করে বিচারপতি সাত্তারকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য করে দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং বিচারপতি আহসান উদ্দিনকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব প্রদান করেন। প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দিনও তার কার্যকালীন সময়ে ১৫ আগস্টকে শোক দিবস হিসেবে ঘোষণা করেননি। অত:পর এরশাদ বিচারপতি আহসানকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই প্রেসিডেন্টের পদ দখল করেন এবং প্রায় ৯ বছর দেশ শাসন করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরশাদ দীর্ঘ সময় দেশ শাসন করলেও ১৫ আগস্টকে শোক দিবস ঘোষণা করেননি। এখানে উল্লেখ্য যে এরশাদের অবৈধ ক্ষমতা দখলকে আওয়ামী লীগ সমর্থন জানিয়েছিল। মুজিব বিরোধী প্রবল জনমতের কারণে এরশাদ আওয়ামী লীগের সমমনা হলেও ১৫ আগস্টকে শোক দিবস ঘোষণার ঝুঁকি নেননি। '৯০-এর গণআন্দোলনের ফলে এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ সকল রাজনৈতিক দলের সম্মতিক্রমে নির্দলীয় নিরপেক্ষ অর্ন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের কবর জিয়ারত করেন। তার পূর্বে আর কোনো রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয়ভাবে শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করেননি। নির্দলীয় নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দীনও ১৫ আগস্ট শোক দিবস বা সরকারি ছুটি ঘোষণা করেননি। ১৯৯১ সালে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেন। উল্লেখ্য যে, '৯১ সালে দেশে প্রেসিডেন্সিয়াল সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়।

বেগম খালেদা জিয়ার ৫ বছরের শাসনামলেও ১৫ আগস্ট শোক দিবস ঘোষণা করা হয়নি। যদিও বেগম খালেদা জিয়া গোপালগঞ্জে সফরের সময় একবার শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করেছিলেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করার মত আসন লাভে ব্যর্থ হয়। অতঃপর পতিত স্বৈরাচার এরশাদ ও গৃহপালিত রাজনীতিক বলে খ্যাত আ স ম রবের জাসদের সমর্থনে ২১ বছর পর সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়। সরকার গঠন করেই আওয়ামী লীগ ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা করে। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট মুজিব নিহত হবার পর কেবলমাত্র ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী সরকার ক্ষমতাসীন থাকাকালীন সময়েই ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও সরকারি ছুটি পালিত হয়েছে। এ যাবৎ আওয়ামী সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকারের আমলে; এমনকি বর্তমান আওয়ামীবান্ধব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও সরকারি ছুটি পালিত হয়নি। ২০০৮ সালের ১৫ আগস্ট মহামান্য আদালতের নির্দেশে শোক দিবস ও সরকারি ছুটি পালিত হয়েছে। তাই জোট মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণীতে পূর্বে কখনও ১৫ আগস্ট শোক দিবস ও সরকারি ছুটি পালিত হয়নি বলতে আওয়ামী সরকার ছাড়া অন্য কোনো সরকারের আমলের কথাই বুঝানো হয়েছে। এতে তথ্যগত কোনো ভুল নেই। কেননা পূর্বে যদি কোনো সময় শোক দিবস পালিত হতো তবে তা বাতিলের প্রশ্নই উঠতো না এবং আদালতেও মামলা হতো না। মুজিব হত্যার একুশ বছর পর আওয়ামী সরকার কর্তৃক হঠাৎ ১৫ আগস্ট শোক দিবস ঘোষণাকে যুক্তিসঙ্গত ও জনস্বার্থে করা হয়েছে-একথা বলার কোনো অবকাশ নেই। জোট সরকার নয় বরং আওয়ামী সরকারের সিদ্ধান্তই অস্বচ্ছ, অসঙ্গত ও কর্তৃত্বপরায়ণ ছিল বলা যায়। আওয়ামী সরকারের এই সিদ্ধান্ত যে জনচেতনার পরিপন্থী ছিল তা পরবর্তী নির্বাচনে (২০০১) আওয়ামী লীগের ভরাডুবি থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। অপ্রিয় হলেও সত্য যে, ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ মুজিবের মর্মান্তিক মৃত্যু বাংলাদেশের মানুষকে এতটুকু শোকাহত করেনি। বরং শেখ মুজিবের একদলীয় স্বৈরশাসনের অবসানে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছিল। মুজিবের মৃত্যুতে দেশী-বিদেশী কেউই শোক প্রকাশ করেনি। আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের যে সব নেতা-কর্মী সব সময় বলতো মুজিব তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে। তারা মুজিবের লাশ দাফন করতেও এগিয়ে আসেনি। মুজিবের মর্মান্তিক মৃত্যুতে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ছাড়া আওয়ামী লীগের আর কেউ প্রতিবাদ করারও প্রয়োজন মনে করেননি। প্রতিবাদ করার 'পুরস্কারস্বরূপ' মুজিব কন্যা তাকে দল থেকেই বের করে দিয়েছেন। এমনকি মুজিবের দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা বিদেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও তারা একটা সংবাদ সম্মেলন করেও পিতার এই মর্মান্তিক হত্যার প্রতিবাদ করেননি। বস্তুত আওয়ামী দুর্নীতি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত এত প্রবল ছিল যে তারা প্রতিবাদ করার কথা চিন্তাই করতে পারেননি। ২০০১ সালে নির্বাচনে বিপুল আসনে বিজয়ী জোট সরকার কর্তৃক ১৫ আগস্ট শোক দিবস ও সরকারি ছুটি বাতিল অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও জনমতের পরিপূরক ছিল। কেননা '৭৫-এর ১৫ আগস্ট জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত মুজিবকে নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার '৯৬ হতে ২০০১ সাল পর্যন্ত যে বাড়াবাড়ি করেছে তাতে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। তখন জনমত উপেক্ষা করে দেশের বড় বড় স্থাপনার নাম বদল করে মুজিবের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। টেলিভিশন খুললেই দেখা যেত মুজিব বন্দনা। জাতীয় খবরের আগে মুজিবের সকণ্ঠ ভাষণ শোনানো হতো। টাকার মধ্যে মুজিবের ছবি ছাপানো হয়। গণধিকৃত মুজিবের ছবি টাকার উপর ছাপানোর ফলে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জনগণ এই ক্ষোভ প্রশমনের জন্য টাকার ওপর মুজিবের ছবি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকৃত করা শুরু করে। এই ছবি বিকৃত করার প্রবণতা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, আওয়ামী সরকার মুজিবের ছবি বিকৃতকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। বিশ্বের কোনো দেশের জনগণ এভাবে টাকায় অংকিত নেতার ছবি

বিকৃত করেছে বলে আমার জানা নেই। বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মুজিবের ছবি মূর্তি ও নামফলক জনরোষ হতে রক্ষার জন্য সার্বক্ষনিক পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। এসব ঘটনা হতেই জনগণের মনে মুজিবের স্থান কোথায় তা অনুমাণ করা যায়। আইন করে কাউকে সম্মান দেয়া যায় না। ২০০১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে শেখ হাসিনা মুজিব হত্যার বিচার কাজ সম্পন্ন করার জন্য আরেক টার্মের জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার জন্য জনগণের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোটের মাধ্যমে নজিরবিহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে। ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মাত্র ৫৮টি আসন লাভ করে। চারদলীয় জোটকে জনগণ দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসনে বিজয়ী করে। জনগণের এই ঐতিহাসিক ম্যান্ডেটের কারণেই জোট সরকারের মন্ত্রিপরিষদের কার্যবিবরণীতে বলা হয়েছে- "পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে ১৫ আগস্ট ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্তটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন ও সমীচীন।" সরকার গঠন করার মত আসন না পেয়েও যদি আওয়ামী লীগ ১৫ আগস্ট শোক দিবস ও ছুটি ঘোষণা করতে পারে; তবে দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসন পেয়ে জোট সরকার ১৫ আগস্ট শোক দিবস ও ছুটি বাতিল করে অসঙ্গত বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজ করেছে এটা মনে করার কোনো যুক্তি নেই। জনগণের ভোটে নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকারের মন্ত্রিসভার সংবিধান সম্মত সিদ্ধান্ত উচ্চ আদালতের রায়ে বাতিল হওয়ার প্রেক্ষিতে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কেননা মন্ত্রিসভায় যদি কোনো গণবিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তবে এর দায় সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের উপরই বর্তাবে। যেমন আওয়ামী লীগ জনমত উপেক্ষা করে ১৫ আগস্ট শোক দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা করায় জনগণ পরবর্তী নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই রাজনৈতিক ইস্যুকে আদালতে না নেয়াই উত্তম। শেখ মুজিব একজন বিতর্কিত রাজনৈতিক নেতা। দেশের সকল মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা নেই। সংবিধানেও তাকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়নি। যদি তর্কের খাতিরেও ধরে নিই শেখ মুজিব জাতির পিতা তাহলেও তার মৃত্যু দিবসে শোক দিবস ও সরকারি ছুটি পালন করতে হবে-এমন কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। আদালতে সবকিছুই আইনের ভিত্তিতে বিচার্য। ১৫ আগস্ট শোক দিবস বা ছুটি পালন করা হবে কি হবে না- এটা একটি রাজনৈতিক ইস্যু। রাজনৈতিক ইস্যুর মীমাংসা করার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন রাজনৈতিক বিষয়কে আদালতে না নেয়ার জন্য রাজনীতিকদের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমাদের দেশে একশ্রেণীর রাজনীতিক রাজনৈতিক সমস্যা রাজনীতি দিয়ে সমাধান করতে না পেরে তা আদালতে নিয়ে যান। এটা রাজনীতিকদের ব্যর্থতারই পরিচায়ক। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন সংস্কারপন্থী বলে পরিচিত মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিনকে বিএনপির মূলধারা সাব্যস্ত করে সংলাপের আমন্ত্রণ জানিয়ে আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করলে বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বিজ্ঞ আদালত এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না দিয়ে মামলাটি খারিজ করে দেন। মামলা খারিজ করে মহামান্য আদালত যথার্থ কাজই করেছেন কেননা একটি দলের কোনটি মূলধারা তা আদালতের রায়ে সাব্যস্ত হওয়া উচিত নয়। কথায় বলে বৃক্ষ তুমি কি ফলেই পরিচয়! মূলধারা কোনটি তা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত হয়। বিএনপির বেলায়ও যেমনটি হয়েছে। খালেদা-দেলোয়ারের নেতৃত্বাধীন বিএনপি যে মূলধারা তা সময়েই বলে দিয়েছে। এর জন্য আদালতের রায়ের প্রয়োজন হয়নি। সিইসি ড. হুদা তার ভুল(?) বুঝতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। রাজনীতিতে যেখানে শেষ কথা বলে কিছুই নেই সেখানে শেষ ফায়সালা না দেয়াই উত্তম। আদালত যদি বিএনপির স্থায়ী কমিটির কথিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হাফিজপন্থীদের মূলধারা বলে রায় দিতেন তবে আদালত সম্পর্কে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো। এজন্য রাজনৈতিক ইস্যুর ফায়সালার দায়িত্ব আদালতের উপর ন্যস্ত করে মহামান্য আদালতকে বিতর্কিত না করাই যুক্তিযুক্ত। ১৫ আগস্ট শোক দিবস বা সরকারি ছুটি

পালিত হবে কিনা এটা জনগণের উপর ছেড়ে দেয়াই যুক্তিযুক্ত। মহামান্য আদালত ১৫ আগস্ট শোক দিবস বাতিল আদেশ অবৈধ ঘোষণা করে যে রায় প্রদান করেছেন তা উচ্চ আদালতের পূর্ববর্তী আদেশের পরিপন্থী ও সাংঘর্ষিক। কেননা ইতিপূর্বে মহামান্য আদালত কাজী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি অধ্যাদেশ এই বলে খারিজ করেছেন; তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব রুটিন দায়িত্ব পালন করা, রুটিন দায়িত্বের বাইরে নির্বাচন সংক্রান্ত ছাড়া অন্য কোনো অধ্যাদেশ জারির এখতিয়ার এই সরকারের নেই। সরকার উচ্চ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল না করার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন তা বোধগম্য নয়। আপিল না করেই তড়িঘড়ি করে রায় কার্যকর করায় সরকারের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। অথবা আপিল যেহেতু করা হয়নি সেহেতু রায় কার্যকর করার বিষয়টি পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের জন্য রেখে দেয়াই যুক্তিযুক্ত ছিল। বিচারপতি আব্দুর রশিদ তার রায়ে লিখেছেন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে একটি ইতিহাস-তার কণ্ঠস্বর আজও লাখ লাখ মানুষকে আন্দোলিত করে। এ জাতি হয়তো নিজ জাতি রাষ্ট্রের সংগ্রাম ও বিজয়ের অর্জনসমূহের মূল্যায়নে অভিন্ন অবস্থানে নাও পৌঁছাতে পারে, কিন্তু তাই বলে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাকে কাপুরোষোচিতভাবে হত্যার দিনটিকে সবটুকু শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্যে স্মরণ না করার অধিকার হতে বঞ্চিত হতে পারে না। জাতীয় শোক দিবস হবে মুজিব নামের এক কিংবদনন্তীর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা নিবেদন।' '৭০-৭১ সালে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। কিন্তু তার মাত্র সাড়ে তিন বছরের অপশাসনে শেখ মুজিব একজন জনপ্রিয় নেতা হতে গণধিকৃত স্বৈরশাসকরূপে ধিকৃত হয়েছেন। আজীবন গণতন্ত্রের কথা বলে শেখ মুজিব গণতন্ত্র বিলুপ্ত করে একদলীয় স্বৈরশাসনের নামে বস্তুত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনামলে ১০ লাখের বেশি আদমসন্তান এক মুঠো ভাতের অভাবে অভুক্ত থেকে রাস্তায় শিয়াল-কুকুরের মত মৃত্যুবরণ করেছে। সিরাজ শিকদারের ৩২ হাজার প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চোরাকারবারি, কালোবাজারি, মজুদদারির ফলে দেশ ধ্বংসের দারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। মুজিবের অদূরদর্শিতার কারণে তিন বিঘা করিডোর না দিয়েই ভারত বেরুবাড়ীকে ভারতের অর্ন্তভূক্ত করে। মুজিবের একপেশে ভারতমুখী পররাষ্ট্র নীতির কারণে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গেও মুজিব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ হন। বন্ধু রাষ্ট্র গণচীনও বাংলাদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, বিদেশনীতি সব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দেশকে এক অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দেয়। কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তখন ব্যর্থ অদক্ষ মুজিবী দুঃশাসন থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। কেননা তখন আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। ৪টি সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ছাড়া অন্য সকল পত্রপত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সরকারি কর্মচারীদের ওপর পিও-৯ আদেশের খবর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। নির্বাচন ছাড়াই মুজিব নিজেকে আজীবন দেশের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছিলেন। এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে একদল দুঃসাহসী সৈনিক মুজিবী দুঃশাসনের অচলায়তন ভাঙতে এগিয়ে আসে। ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে এক সফল ও জনসমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। পতন হয় মুজিবের সাড়ে তিন বছরব্যাপী দুঃশাসনের। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো ঐ দুঃখজনক ঘটনা তখন জনগণকে এতটুকু শোকাহত করেনি। বরং মুজিব সরকারের পতনে জনমনে স্বস্তি ফিরে আসে। আনসার, পুলিশ, বিডিআর, রক্ষীবাহিনী, সামরিক বাহিনীসহ সর্বস্তরের জনগণ ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানায়। লক্ষণীয় বিষয় হলো সামরিক অভ্যুত্থান হলেও সামরিক বাহিনী কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেনি। তারা আওয়ামী লীগের কাছেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়। শেখ মুজিব কোনো আধ্যাত্মিক নেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা, দেশের প্রধানমন্ত্রী ও পরে প্রচণ্ড ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট। একজন ক্ষমতাসীন নেতার কর্মকাণ্ডের

মূল্যায়ন ও আলোচনা-সমালোচনা হওয়াই স্বাভাবিক। মুজিবকে সমালোচনার উর্ধ্বে উঠিয়ে তার ওপর দেবত্ব আরোপের কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। আর একজন রাজনৈতিক নেতাকে মূল্যায়ন করতে হলে তার সার্বিক কর্মকাণ্ড বিচার-বিশ্লেষণ করেই মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত। খণ্ডিতভাবে মূল্যায়ন করে তাকে দেবতার আসনে বসানো ইতিহাসকে অস্বীকার করারই নামান্তর। স্মর্তব্য যে, ১০/১২ জন বিচারপতি শেখ মুজিবের হত্যার বিচার করতে গিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন, এটা নজিরবিহীন। এর পেছনে হেতু নিশ্চয়ই আছে। মূল্যায়নকারীদের সেটা বুঝতে হবে। কাজেই মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়েরকৃত মামলার রায়ে মুজিব বন্দনা অনভিপ্রেত। এটা ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মতই অপ্রাসঙ্গিক। একজন বহুল আলোচিত সমালোচিত ও বিতর্কিত রাজনৈতিক নেতা সম্পর্কে এ ধরনের একপেশে মন্তব্য মহামান্য আদালতের মর্যাদা ও নিরপেক্ষতাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করবে। ভবিষ্যতে কেউ এই মনতব্যকে রেফারেন্স হিসেবে অপব্যবহার করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল না করে এই রায় রাতারাতি কার্যকর করেছে। বিচার প্রক্রিয়ার শেষ ধাপে অর্থাৎ আপিল না করেই রায় কার্যকর করার সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

২০০৮